কণিকনীতি



কালীপ্রসন্ন সিংহ

কণিকনীতি

কালীপ্রসন্ন সিংহ

সারস্বত প্রকাশন

২০২৩

Image Credit:

Image by Pexels from Pixabay

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay

Software Credit:

Free Bangla keyboard and font — Avro and Kalpurush

Free and open-source EPUB editor — Sigil

Free and open-source visual XHTML editor — PageEdit

Free and open-source image editor — GIMP

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

কণিকনীতি মহাভারতের অংশ। মহাভারতের ১৮টি পর্ব; প্রতিটি পর্ব আবার কতকগুলি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে অনেকগুলি শ্লোক। কণিকনীতি মহাভারতের প্রথম পর্ব অর্থাৎ আদিপর্বের অন্তর্গত। আদিপর্বের ১৪২তম অধ্যায় এটি। এই অধ্যায়ে ৯৩টি শ্লোক রয়েছে। মহাভারতের পর্বগুলি এত বড়, যে সেগুলিকে ছোট ছোট কিছু পর্ব্বাধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে সুবিধের জন্য। তো সেই হিসেবে এটি আদিপর্বের অন্তর্গত সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়ের শেষ অধ্যায়।

এবারে নীতি বা নীতিশাস্ত্র কি সেটা একটু বলে নেওয়া প্রয়োজন। নীতি মানে চলতি কথায় আমরা যেটা বুঝি সেটা কতকটা এই রকম — "গোপাল বড় সুবোধ বালক, সে সদা সত্য কথা বলে। সূতরাং গোপাল খুব ন্যায়নীতিপরায়ণ ছেলে।" প্রাচীন ভারতীয় নীতিশাস্ত্র কিন্তু আদতেই তা নয়। এই নীতি হল রাজনীতি। রাজা কি করে সুষ্ঠভাবে দেশ চালাবেন তার উপদেশ। এখন দেশ চালানো ব্যাপারটা মোটেই সুবোধ বালকের কাজ নয়। শত্রুরা সর্বদা চেষ্টা করছে কি করে ছলে বলে কৌশলে আপনার সাধের রাজ্যটি হস্তগত করতে পারে। শত্রু ঘরে, শত্রু বাইরে। কে শত্রু আর কে বন্ধু চেনা কঠিন। এই পরিস্থিতিতে আপনাকে শত্রুর থেকে সর্বদা এক পা এগিয়ে থাকতে হবে। আপনি বাঁচলে, তবে তো আপনার রাজ্যের আপনি প্রজাদের হিতসাধন করবেন। সূতরাং এই নীতি হল অত্যন্ত বাস্তবধর্মী বিষয়। ঘোর বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে রাজা ও রাজ্যের জীবন মরণের পাটিগণিত। ন্যায় অন্যায়ের চিরাচরিত মানদন্ড এখানে খাটে না। এই রাজনীতির জ্ঞান যে শাস্ত্রে বলা আছে তাই হল নীতিশাস্ত্র।

প্রাচীন ভারতে নীতিশাস্ত্রের দুটি ধারা ছিল — বৃহস্পতিনীতি এবং শুক্রনীতি। ঐতিহাসিক সময়ে আমরা পাই বিখ্যাত নীতিশাস্ত্রবিদ কৌটিল্য বা চাণক্যকে, যিনি মৌর্য্য সাম্রাজ্যের রূপকার। কৌটিল্যের পরবর্তী সময়ে কামন্দকের লেখা "নীতিসার" একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিশাস্ত্রের গ্রন্থ। এছাড়াও, কিশোর অবস্থাতেই গল্পের ছলে যাতে নীতিশাস্ত্রের পাঠ রাজপুত্রেরা পেতে পারে তাই বিষ্ণুশর্মা রচনা করেছিলেন পঞ্চতন্ত্র। হিতোপদেশের

গল্পগুলিও নীতিশাস্ত্রের বিষয়েই। পঞ্চতন্ত্রের দুটি তন্ত্র (বা ভাগের) গল্পই একটু অন্যভাবে বলা হয়েছে হিতোপদেশে।

এখন কণিক হলেন মহাভারতের সময়কালের একজন নীতিশাস্ত্রবিদ; তিনি মন্ত্রীও বটে। ইনি বৃহস্পতিনীতির একটি শাখা ভরদ্বাজনীতির অনুসারী। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কণিককে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এবারে যে পটভূমিতে ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে ডেকেছেন সেটা একটু জেনে নেওয়া প্রয়োজন। মহাভারতের মূল কাহিনী আমাদের সকলেরই জানা। তাই খুব সংক্ষেপে বলি — হস্তিনাপুরের রাজা বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু হয়েছে। তার বড় ছেলে ধৃতরাষ্ট্র রাজা হতে পারলেন না যেহেতু তিনি অন্ধ। তাই সেক্ষেত্রে নিয়ম অনুসারে সিংহাসনের উত্তরাধিকার পেলেন তার ভাই পান্ডু। তিনি প্রথমে দিগ্বীজয়ে গেলেন, তারপরে অরণ্যে মৃগয়া করতে গেলেন দুই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। ধৃতরাষ্ট্র তখন রাজ্যভার সামলাচ্ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধনসহ একশো পুত্র এবং এক কন্যা হয়েছিল। দুর্যোধন এদের মধ্য বড়। বনে পান্ডুর স্ত্রী কুন্তি এবং মাদ্রীর গর্ভে পান্ডুর পাঁচজন ক্ষেত্রজ সন্তান জন্ম নিয়েছিলো — এরা পান্ডব নামে পরিচিত। ক্ষেত্রজ সন্তান মানে কোন ব্যক্তির ঔরসজাত সন্তান নয়, কিন্তু তার স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। পান্ডুর বড় ছেলের নাম যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের থেকেও বড়। এবারে পান্ডু ও মাদ্রীর মৃত্যুর পরে কুন্তি পাঁচ পুত্র নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। যেহেতু সব ভাইয়েদের মধ্যে যুধিষ্ঠির সবার বড় তাই নিয়ম অনুসারে যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করে দিয়েছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। যুধিষ্ঠিরের সুনাম ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। সমস্যার সূত্রপাত। ধৃতরাষ্ট্র ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন। এই সময়েই ধৃতরাষ্ট্র কণিককে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কণিক চলে যাওয়ার পরে মহাভারতে শুরু হবে জতুগৃহ পর্ব্বাধ্যায়। ধৃতরাষ্ট্র পান্ডবদের বারণাবতে পাঠিয়ে দেবেন। সেখানে জতুগৃহ নির্মিত হয়েছে এবং তাদের সেখানে পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

এই বইয়ে কণিকনীতি অংশটি কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের বঙ্গানুবাদ থেকে নেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মন্মথনাথ দত্তের এবং কিশোরীমোহন গাঙ্গুলীর মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদেরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়া গীতাপ্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত সংস্কৃত শ্লোকসহ হিন্দী অনুবাদেরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদের

অতিরিক্ত যা কিছু যোগ করা হয়েছে, সেগুলি তৃতীয়বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে। যেক্ষেত্রে ভাষা কঠিন মনে হয়েছে সেক্ষেত্রে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে সহজ বাংলা অর্থ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে শ্লোক সংখ্যা আলাদা করে দেওয়া নেই। মন্মথনাথ দত্তের অনুবাদে শ্লোকসংখ্যা দেওয়া আছে। গীতাপ্রেসের অনুবাদেও শ্লোক সংখ্যা উল্লেখ করা আছে। গীতাপ্রেসের অনুবাদের শ্লোকসংখ্যা অনুসারেই এখানে শ্লোকসংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। আরেকটা কথা, কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে কণিকনীতি অধ্যায়ের সংখ্যা ১৪০। গীতাপ্রেসের অনুবাদে এটি ১৩৯তম অধ্যায়। কিন্তু মন্মথনাথ দত্তের এবং কিশোরীমোহন গাঙ্গুলীর অনুবাদেও কণিকনীতি ১৪২তম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সব অনুবাদেই এটি সম্ভব পর্ব্বাধ্যায়ের শেষ অধ্যায়; সেখানে কোন মতবিরোধ নেই। বইয়ের শেষে অভিধান অংশ যুক্ত করা হয়েছে যেখানে কঠিন শব্দের অর্থের তালিকা যোগ করা হয়েছে। কিছু বিষয় যেখানে একটু গভীরে আলোচনা প্রয়োজন মনে হয়েছে তা পাদটীকায় যোগ করা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের কিছু শ্লোকের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। সেইকাজে রাধাগোবিন্দ বসাকের অনুবাদিত “কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র” এবং প্যাট্রিক অলিভেলের ইংরাজী অনুবাদ “কিং, গভর্ন্যান্স এন্ড ল ইন এন্সিয়েন্ট ইন্ডিয়াঃ কৌটিল্য'স অর্থশাস্ত্র” — এই দুটি গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

আর কিছু বিশেষ বলার নেই। হিতোপদেশের একটা গল্প মনে পড়ছে। যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পরে এক রাজা তার বিদগ্ধ মন্ত্রীকে প্রশ্ন করছেন যে এই পরাজয়ের কারণ কি? যদিও দেরী হয়ে গেছে। তবু। মন্ত্রী তখন উত্তর দিয়েছিলেন যে মহারাজ আপনি যুদ্ধশাস্ত্র জানেন কিন্তু নীতিশাস্ত্র জানেন না। তাই হেরে গেছেন। মাঝে মাঝে মনে হয়, সম্রাট পৃথ্বীরাজ চৌহানের যদি নীতিশাস্ত্রের সামান্য জ্ঞানও থাকত তাহলে ভারতের ইতিহাস আজ অন্য রকম হত।

~

❀

"যে রাজা যুদ্ধে জয়ী হতে চান, তিনি সবার প্রথমে নিজের ও শত্রুর শক্তি, দেশ, কাল, অভিযানের উপযুক্ত সময়, সৈন্য সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়, সেনাবাহিনীর পিছনের অংশের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা, লোকক্ষয়, অর্থব্যায়, লাভ, এবং বিপদের সম্ভবনার তুলনামূলক সবলতা ও দুর্বলতার বিষয়ে সম্যকরূপে জ্ঞাত হয়ে, যদি মনে করেন তিনি অধিক বলবান অবস্থায় রয়েছেন, তবেই তিনি যুদ্ধের অভিযানে অগ্রসর হবেন, নাহলে, চুপচাপ নিজের রাজ্যে অবস্থান করবেন।"

— কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ৯.১.১

কণিকনীতি

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহীপাল ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর পাণ্ডুপুত্রদিগকে বলমদোন্মাদিত দেখিয়া অত্যন্ত কাতর ও একান্ত চিন্তান্বিত হইলেন। ১

তৎপরে মন্ত্রজ্ঞ নীতিনিপুণ মন্ত্রিবর কণিককে আহ্বান করিয়া কহিলেন — ২

হে দ্বিজোত্তম! পাণ্ডবেরা নিত্য উৎসিক্ত[১], এই নিমিত্ত আমি সাতিশয় অসূয়াপরবশ[২] হইতেছি; অতএব তাহাদিগের সহিত সন্ধিবিগ্রহের[৩] অন্যতর কি ব্যবহার করিব? তুমি নিশ্চয় করিয়া বল, আমি তোমার কথার অন্যথা করিব না। ৩

প্রসন্নমনা নীতিশাস্ত্রবিশারদ মন্ত্রিবর ভূপালের আদেশ পাইয়া নীতিশাস্ত্রানুসারে কহিলেন — ৪

মহারাজ! আমি যাহা কহি, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন; কিন্তু মহারাজ! আমার বাক্য নিতান্ত অপ্রিয় হইলেও রোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন না। ৫

রাজার নিরবচ্ছিন্ন দণ্ড বা নিয়ত পৌরুষ প্রকাশ করা উচিত (অর্থাৎ রাজার সর্বদা কঠোরভাবে দেশ শাসন করা উচিত)। যাহাতে প্রতিপক্ষেরা কোষবলাদির[*] কোন অনুসন্ধান লইতে না পারে, এমন বিষয়ে তাঁহার সতত সাবধান থাকা আবশ্যক। তিনি সাধ্যানুসারে বিপক্ষের রন্ধ্রান্বেষণে তৎপর হইবেন। ৬

রাজা প্রতিনিয়ত উদ্যতদন্ড হইলে লোকে ভীত হইয়া গর্হিত কর্ম্মের প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে, এই কারণে তিনি দণ্ডদ্বারা সর্ব্বকার্য্যের সমাধা করিবেন। ৭

রাজার আত্মছিদ্র গোপন ও পরচ্ছিদ্রের অনুসরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তাহার সহায়, সাধন ও উপায়[†] প্রভৃতি রাজ্যাঙ্গের[††] গোপন করা [কচ্ছপ যেমনকরে তার শরীর খোলের মধ্য লুকিয়ে রাখে ঠিক তেমন করে] ও আত্মকৃত নিন্দিত ব্যাপারের সংবরণ করা একান্ত

বিধেয় (অর্থাৎ শত্রু যেন রাজার কোন দুর্বলতা জানতে না পারে, অথচ রাজা যেন শত্রুর দুর্বলতাগুলি সম্বন্ধে অবহিত থাকেন এবং রাজা যেন তার নিজের শক্তি ও সহায় শত্রুর থেকে গোপন রাখতে পারেন)। ৮

কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া নিঃশেষে তাহার সমাধা করা রাজার পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য; কারণ অসম্যক্ উচ্ছিন্ন সামান্য কন্টকও কালক্রমে ব্রণকারক হইয়া উঠে। ৯

অপকারী শত্রুকে বধ করাই সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। আপৎকাল উপস্থিত হইলে অসংশয়িতচিত্তে যুদ্ধবিক্রম প্রকাশ বা পলায়ন[‡], যাহাতে আপনার সুবিধা হয়, তাহাই করিবেন। শত্রু দুর্ব্বল হইলেও কোনক্রমে অবজ্ঞেয় নহে। ১০-১১

কারণ সামান্য অগ্নিকণাও সমুদায় বন ভস্মসাৎ করিতে পারে। সময়বিশেষে রাজা শত্রুর অত্যাচারে দৃষ্টিপাত ও কর্ণপাত না করিয়া অন্ধ ও বধির হইয়া থাকিবেন (অর্থাৎ রাজার যখন শত্রুকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে না, তখন রাজার উচিত শত্রুর অত্যাচার দেখেও না দেখার ভান করা; বোবা-কালা হয়ে থাকা)। ১২

শরাসন[৪] তৃণতুল্য অসার বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিবেন এবং মৃগের ন্যায় সাবধান হইয়া আত্মরক্ষা বিষয়ে যত্নশালী হইবেন (অর্থাৎ এই সময় রাজাকে মনে করতে হবে ধনুক যেন খড়ের তৈরী — মানে শত্রুর সামনে নিজেকে অসমর্থ দেখাতে হবে, কিন্তু হরিণের মত সতর্ক থাকতে হবে)। তৎপরে সামাদি উপায়দ্বারা শত্রুকে বশে আনিয়া তাহাকে বিনাশ করিবেন (অর্থাৎ তারপরে শত্রু যখন নিজের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে তখন যেকোন উপায়ে, তাকে ধ্বংস করতে হবে)। ১৩

কিন্তু সে যদি শরণাপন্ন হয়, তথাচ তাহার প্রতি কদাচ অনুকম্পা প্রদর্শন করিবেন না (সে যদি আশ্রয় চায় তাতেও তাকে ক্ষমা করা চলবে না)। শত্রু সংহার করিতে পারিলে, নির্ভীক (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি কখনো ভয়ের কারণ হয় না) ও নিরুদ্বিগ্ন হওয়া যায়। ১৪

পরিচারকদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থদানপূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিয়া শত্রু ও পূর্ব্বাপকারীকে বিনষ্ট করিবেন (অর্থাৎ পুরোনো শত্রু, যে একবার ক্ষতি করেছে, প্রয়োজনে টাকা দিয়ে তার

লোকজনকে কিনে নিয়ে তাকে হত্যা করতে হবে)। শত্রুপক্ষীয়দিগকে যত বিনষ্ট করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে কদাচ ত্রুটি করিবেন না। ১৫

প্রথমতঃ যাহাতে প্রতিপক্ষের মূলোচ্ছেদন হয়, এমন চেষ্টা পাইবেন। পরে তাহার সহায় ও তৎপক্ষদিগকে বিনাশ করিবেন। সমূলোচ্ছেদন হইলে তদুপজীবী সকলে অনায়াসে বিনষ্ট হয় (অর্থাৎ যে মূল শত্রু তাকে ধ্বংস করতে পারলে তার যারা মিত্রশক্তি তাদেরকে অনায়াসেই বিনষ্ট করা যাবে)। ১৬

মহারাজ! বনস্পতি সমূলে উন্মূলিত হইলে তাহার শাখা, পল্লব বা পত্রসকল কি আর পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত থাকিতে পারে? রাজা একাগ্রচিত্তে নিজাভিসন্ধি গোপন করিয়া সর্ব্বদা পরচ্ছিদ্র দর্শনে তৎপর হইবেন। ১৭

নিত্যোদ্বিগ্ন হইয়া শত্রুর প্রতি সম্যক্ ব্যবহার করিবেন (অর্থাৎ সদা সতর্কভাবে রাজ্য শাসন করবেন)। অগ্ন্যাধান[৫], যজ্ঞানুষ্ঠান, কাষায়বস্ত্র[৬] পরিধান ও জটাজিন[৭] দ্বারা লোকদিগকে বিশ্বসিত করিয়া (শত্রুদের বিশ্বাস উৎপাদন করে) পরে বৃকের[৮] ন্যায় স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। অর্থসংগ্রহ বিষয়ে শৌচই অঙ্কুশস্বরূপ[৯] হয়, তদ্বারা ফলবতী শাখা আনমিত করিয়া সুপক্ক ফল গ্রহণ করিবেন (কথায় আছে, ভেক না ধরলে ভিক্ষে মেলে না; অর্থাৎ সাধুর ভেক ধরলে অর্থ রোজগার করা যায় সহজে। ঠিক তেমনই, গাছের উঁচু শাখায় পাকা ফল থাকলে তা পাড়ার জন্য আঁকশি ব্যবহার করা হয়। তাই সাধুর ভেক হচ্ছে আঁকশির মত; কাজ হাসিল করার সহজ রাস্তা। ঠিক তেমন করেই শত্রু ধ্বংস করতে হবে); ১৮-২০

কারণ, পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যদবধি সময় আগত না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত শত্রুকে স্কন্ধে বহন করিবে। অনন্তর নির্দ্দিষ্টকাল উপস্থিত হইলে, যাদৃশ মৃন্ময় ঘটকে প্রস্তরোপরি নিক্ষেপ করিলে চূর্ণ করা যায়, তাদৃশ অপকারী শত্রুকে বিনাশ করিবে। বহুভাষী[১০] ও কৃপণ[১১] শত্রুকেও পরিত্যাগ করিবে না এবং তাহার প্রতি প্রসন্নভাব প্রদর্শন করাও নিতান্ত নিষিদ্ধ; প্রত্যুত যেরূপে হউক, তাহাকে বিনষ্ট করিবে (অর্থাৎ শত্রুকে কখনো ছেড়ে দেবে না, সে যদি কাতর ভাবে অনুনয় করে তাতেও ছাড়বে না। তাকে কোনরকম দয়া দেখাবে না,

তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করবে); অধিক কি, সন্ধি, দান, ভেদ ও দণ্ড এই সমস্ত উপায়দ্বারাও শত্রুসংহার করা বিধেয়, তাহা হইলে সকল বিষয়ে শান্তিলাভ হয়। ২১-২৩

এই কথা শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কণিক! সন্ধি, দান, ভেদ ও দণ্ডদ্বারা কি প্রকারে শত্রুসংহার করা যাইতে পারে, তুমি আমার নিকটে আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বল। ২৪

কণিক কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে নীতিশাস্ত্রবিশারদ অরণ্যবাসী জম্বুকের[১২] যেরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ২৫

কোন বনে এক শৃগাল, — ব্যাঘ্র, ইন্দুর, বৃক ও নকুল, এই চারি বন্ধুর সহিত একত্র বাস করিত। জম্বুক অতিশয় ধূর্ত্ত, বুদ্ধিমান্ ও স্বার্থপরায়ণ ছিল। ২৬

তাহারা একদা বনমধ্যে যূথপতি এক মৃগকে লক্ষ্য করিয়া বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু মৃগ অতিশয় বলবান্, এই নিমিত্ত তাহারা সহসা আপন অভীষ্টসাধনে নিতান্ত অশক্ত হইলে পরিশেষে ২৭

জম্বুক কহিল, হে ব্যাঘ্র! এই মৃগ অতিশয় বুদ্ধিশালী, যুবা ও বেগবান্; সুতরাং তুমি বারংবার যত্ন করিলেও ইহাকে সহসা আক্রমণ করিতে পারিবে না; ২৮

অতএব যে সময়ে ঐ মৃগ শয়ন করিয়া থাকিবে, সেই অবসরে মূষিক গিয়া ঐ হরিণের পাদদ্বয় ভক্ষণ করুক (অর্থাৎ দাঁত দিয়ে পায়ের খুর কেটে নিক), তাহা হইলে ব্যাঘ্র অনায়াসে উহাকে গ্রহণ করিতে পারিবে। ২৯

তৎপরে আমরা সকলে সমবেত হইয়া প্রফুল্লমনে ভক্ষণ করিব। ৩০

তাহারা সকলে একতান মনে জম্বুকের পরামর্শে সম্মত হইল। অনন্তর তাহাদিগের আদেশানুসারে মূষিক গিয়া মৃগের পাদদ্বয় ভক্ষণ করিলে ব্যাঘ্র তাহাকে বধ করিল। ৩১

তখন জম্বুক মৃগকলেবর অবনীতলে বিচেষ্টমান[১৩] দেখিয়া কহিল, অহে! তোমরা সকলে স্নান করিয়া আইস, আমিই ইহা রক্ষা করিতেছি। ৩২

তাহারা শৃগালের বাক্যানুসারে স্নানার্থ নদীতীরে গমন করিল। শৃগালও চিন্তাকুল হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। ৩৩

অনন্তর মহাবল ব্যাঘ্র স্নান করিয়া আগমন করিল এবং শৃগালকে চিন্তাক্রান্ত দেখিয়া কহিল, ৩৪

হে জম্বুক। ভাই! আমাদিগের মধ্যে তুমিই একমাত্র বুদ্ধিজীবী, তুমি কি কারণে শোক করিতেছ? আইস, আমরা মৃগমাংস ভক্ষণ করিয়া বিহার করি। ৩৫

তখন জম্বুক কহিল, হে মহাবাহো! মূষিক যাহা কহিয়াছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি স্নান করিতে গেলে সে অহঙ্কারপরতন্ত্র[১৪] হইয়া আমাকে কহিল, আমিই অদ্য এই মৃগকে বধ করিয়াছি, ব্যাঘ্রের বলবিক্রমে ধিক্! ৩৬

আজ আমারই ভুজবলে তোমাদিগের তৃপ্তিসাধন হইবে। বলিতে কি, সে গর্ব্বপূর্বক এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিল; এই কারণে মৃগমাংস ভক্ষণে আমার আর তাদৃশ প্রীতি নাই। ৩৭

তখন ব্যাঘ্র ক্রোধভরে কহিল, হে জম্বুক! যদি সত্যই সে এইরূপ কহিয়া থাকে, ভাল, তুমি যথাকালে আমাকে প্রবোধিত করিয়াছ। আমি অদ্য বাহুবলে বনচরদিগকে বিনাশ করিব। ৩৮

চলিলাম, তুমি তথায় পর্য্যাপ্ত মাংস ভক্ষণ করিবে; এই বলিয়া ব্যাঘ্র বনমধ্যে প্রস্থান করিল। এই অবসরে মূষিক সহসা উপস্থিত হইল। শৃগাল তাহাকে আগত দেখিয়া কহিল, ৩৯

মূষিক! তোমার মঙ্গল তো? বৃক যাহা কহিয়াছে, শুন; ৪০

তুমি স্নান করিতে গেলে সে কহিল, এই মৃগমাংস ভক্ষণ করিতে আমার অভিরুচি নাই, এক্ষণে আমার এই মাংস বিষ বলিয়া বোধ হইতেছে, তোমার মত হইলে আমি এখনই মূষিককে গিয়া ভক্ষণ করি; ৪১

এই কথা শুনিবামাত্র মূষিক অতিমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রাণভয়ে সত্বরে বিবরমধ্যে প্রবেশ করিল। কিছু কাল পরে বৃক স্নান করিয়া তথায় আগত হইল। ৪২

জম্বুক তাহাকে দেখিয়া কহিল, ভাই! ব্যাঘ্র তোমার উপর অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়াছেন, সুতরাং তোমার অনিষ্ট ঘটবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা; তিনি কলত্রসহকারে[১৫] সত্বরে এখানে আসিতেছেন; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর। তখন পিশিতাশন[১৬] বৃক শৃগালের এইরূপ কথা শুনিয়া ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া পলায়ন করিল। এই অবসরে নকুল কৃতস্নান[১৭] হইয়া তথায় আগমন করিল। ৪৩-৪৫

জম্বুক তাহাকে আগত দেখিয়া কহিল, অহে নকুল! আমি নিজ ভুজবলে সকলকে পরাজয় করিয়াছি। পরাজিত হইয়া তাহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। এক্ষণে আমার সহিত যদি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পার, তাহা হইলে তুমি ইচ্ছামত মৃগমাংস ভক্ষণ করিতে পাইবে। ৪৬

তখন নকুল কহিল, হে জম্বুক! ব্যাঘ্র, বৃক ও বুদ্ধিমান্ মূষিক যখন তোমার নিকটে পরাজিত হইয়াছে, সুতরাং তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ সন্দেহ নাই; অতএব তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে আমার আর উৎসাহ নাই; "চলিলাম" এই বলিয়া নকুলও পলায়ন করিল। ৪৭-৪৮

এইরূপে জম্মুক অসাধারণ বুদ্ধিবলে সকলকে বিদায় করিয়া পরম সুখে মৃগমাংস ভক্ষণ করিয়াছিল। ৪৯

যে রাজা এই প্রকার আচরণ করেন, তিনি সুখভোগ করিয়া থাকেন। ভীত ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন, বীরের নিকটে বিনয়ভাব, লুব্ধকে অর্থদান, সম বা ন্যূন ব্যক্তিকে বলপ্রকাশ করিয়া বশীভূত করিবে। মহারাজ! আরও শ্রবণ করুন; ৫০-৫১

পুত্র, সখা, ভ্রাতা, পিতা এবং গুরুও যদি শত্রুর ন্যায় বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে [নিজের উন্নতি চাইলে] তৎক্ষণেই তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে। ৫২

শত্রুকে শপথ, অর্থদান, বিষপ্রয়োগ বা মায়াপ্রকাশ করিয়া (অর্থাৎ ঠকিয়ে বা প্রবঞ্চনা করে) বিনাশ করা বিধেয়, কদাচ উপেক্ষা করিবে না। কিন্তু যদি জিগীষাসম্পন্ন[১৮] উভয়পক্ষই তুল্য বল ও তুল্য উপায়বশতঃ সন্দিহান হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যিনি তন্মধ্যে গাঢ়তর অধ্যবসায়সহকারে জয়শ্রীলাভের প্রত্যাশা করেন, তাঁহারই অভ্যুদয় জানিবেন (অর্থাৎ যদি দুপক্ষই সমান বলবান হন এবং সেজন্য কে সফল হবে তা যদি নিশ্চিত করে বলা না যায়, সেক্ষেত্রে যে বেশী অধ্যাবসায়ী তারই জয় হবে)। ৫৩

আর যদি গুরুও অবলিপ্ত[১৯], কার্য্যাকার্য্যজ্ঞানশূন্য, নিতান্ত নিন্দনীয় ও কুপথগামী হন, তাহা হইলে তাঁহারও শাসন করা ন্যায়বিরুদ্ধ নহে। ক্রোধোদ্রেক হইলেও কদাচ ক্রুদ্ধ হইবে না, সর্ব্বদা সহাস্য আস্যে সকলকে সাদর সম্ভাষণ করিবে (অর্থাৎ হাসিমুখে কথা বলবে)। ৫৪

কোপাক্রান্ত হইয়া কখন অন্যের অপকারে প্রবৃত্ত হইবে না। প্রহারোদ্দেশে বা প্রহারকালে লোকের প্রতি প্রীতিবাক্য প্রয়োগ করিবে (অর্থাৎ রেগে গিয়ে কখনো কাউকে তিরস্কার করবে না। শত্রুকে মারার আগে বা মারার সময়েও মিষ্টি কথাই বলবে)। প্রহার করিয়া কৃপা প্রদর্শন এবং প্রহারবেগে প্রহৃত ব্যক্তি কাতরোক্তিদ্বারা শোক বা রোদন করিলে বিলাপ ও পরিতাপ করা বিধেয় (অর্থাৎ শত্রুকে মারার পরে সমবেদনা জানাবে, দুঃখ প্রকাশ করবে, এমনকি চোখের জলও ফেলতে পারো)। ৫৫-৫৬

শান্তবাক্য, ধর্ম্মোপদেশ ও সদ্ব্যবহারদ্বারা শত্রুকে আশ্বস্ত করিবে। এইরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করিলেও যদি পথিমধ্যে শত্রু সদাচারের অন্যথাচরণ করে (অর্থাৎ ভাল ব্যবহার করা সত্বেও শত্রু যদি সোজাপথে না আসে), তাহা হইলে অবসর বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রহার করিবে। ৫৭

ইহাতে অধর্ম স্পর্শ করিবে না। যেমন কৃষ্ণবর্ণ মেঘ উন্নত মহীধরকে[২০] আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন ধর্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি ধর্ম্মবলে পরিবৃত হইয়া থাকে; ঘোরতর অপরাধী হইলেও দোষী বলিয়া পরিগণিত ও পরিগৃহীত হইতে পারে না (অর্থাৎ অনেক পাপী লোকও ধার্মিকের মত জীবনযাপন করে; এতে তার পাপ ঢাকা পড়ে যায়, ঠিক যেমন মেঘে ঢাকা পড়ে যায় পাহাড়ের চূড়া)। ৫৮

যাহার পক্ষে বধ অবধারিত হইয়াছে, তাহার গৃহে অগ্নি প্রদান করিবে। আর নির্ধন, নাস্তিক ও চৌরগণকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবে। ৫৯

[অতর্কিত আক্রমণের মাধ্যমে, যুদ্ধের মাধ্যমে, বিষ প্রয়োগে, উপহার দিয়ে — যে কোন উপায়ে শত্রু নিধন করবে। চূড়ান্ত নির্মমতার পরিচয় দিতে পার। শত্রুকে যেন প্রানঘাতী আঘাত করতে পারো, এমনভাবেই অস্ত্রে শান দেবে। এমন নিপুণভাবে শত্রুকে ধ্বংস করবে যাতে সে দ্বিতীয়বার মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে।] ৬০

অশঙ্কিত ও শঙ্কিত উভয় হইতেই সর্ব্বদা শঙ্কা করা উচিত (অর্থাৎ যার কাছে থেকে কোন ভয় নেই, তার সম্বন্ধেও সদা সতর্ক থাকবে)। কিন্তু অশঙ্কিত হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে মূলপর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হইতে পারে (অর্থাৎ যার সম্বন্ধে তুমি বিন্দুমাত্র ভীত নও, সে যদি তোমার শত্রু হয়, সে কিন্তু তোমার গোড়া উপড়ে ফেলতে পারে, মানে তোমাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে পারে)। ৬১

অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও অতি বিশ্বাস করিবে না, যেহেতু বিশ্বস্ত হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে মূলপর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হইতে পারে (অর্থাৎ যাকে তুমি বিশ্বাস কর, তার সঙ্গে যদি শত্রুতা তৈরী হয়, সে তোমায় সমূলে উৎপাটন করতে পারে)। ৬২

আপনার ও অন্যের বিধানানুসারে চর নিযুক্ত করিবে (নিজের এবং অপরের রাজ্যে বিশ্বস্ত চর নিয়োগ করবে)। পাষণ্ড ও তাপস (ভেকধারী) প্রভৃতিকে বিপক্ষের রাজধানীতে প্রেরণ করা বিধেয়। ৬৩

উদ্যান, বিহারস্থান, দেবতায়তন, পানাগার, পথ, সর্ব্বতীর্থ (রাষ্ট্রীয় কার্যালয়গুলিতে, যেমন মন্ত্রী, প্রধান পুরোহিত, সেনাপতি, কোষাধ্যক্ষ, দুর্গের অধিপতি, অস্ত্রাগারের প্রধান ইত্যাদি ১৮টি কার্যালয়ে), চত্বর, কূপ, পর্ব্বত, বন, সর্বসমবায়[২১](যে সব জায়গায় লোকজন জড়ো হয়), ও নদীতীরে মন্ত্রণা করিবে (তাদেরকে নিযুক্ত করবে)। ৬৪-৬৫

হৃদয়ে ক্ষুরধার রাখিয়াও সর্ব্বদা সহাস্যমুখে, মিষ্টবাক্যে, বিনীতভাবে সম্ভাষণ করিবে; যখন কোন ভয়াবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, তখন মুখে হাসি রেখে করবে। ৬৬

যিনি ঐহিক সম্পত্তির প্রত্যাশা করেন, তিনি করপুটে প্রার্থনা, শপথ, সান্ত্ববাদ[২২], পাদবন্দন ও আশা করিবেন (অর্থাৎ উন্নতি চাইলে, প্রয়োজনে হাতজোড় করা, শপথ নেওয়া, আশ্বস্ত করা, পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করা, আশা দেওয়া এসব করা উচিত)। ৬৭

[রাজনীতিতে একজন ব্যক্তিকে এমন একটা গাছের মত হতে হয় যাতে ফুল অনেক থাকে, কিন্তু কোন ফল থাকে না। যদি কোন ফল থাকেও তা যেন অনেক উঁচুতে থাকে, হাতের নাগালের বাইরে। যদি পাকা হয়, বাইরে থেকে যেন দেখতে কাঁচা লাগে।] মূল শ্লোকটি এটাই। কালীপ্রসন্ন সিংহ যে ভাবার্থ লিখেছেন তা হল — “কেহ কোন বিষয় প্রার্থনা করিলে অগ্রে বাক্যেতে তাহাকে নিরাশ করিবে না; কিন্তু প্রদানকালে নানাপ্রকারে বিঘ্নানুষ্ঠান করিবে। প্রার্থীকে নানা প্রকারে আশা প্রদান করিবে। কিন্তু কখন প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিবে না। যদি কখন তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ কর তাহাও সত্বরে করা অবিধেয়।” ৬৮

[ত্রিবর্গের] ত্রিবিধ পীড়া ও ফলসিদ্ধি আছে (ত্রিবর্গের অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কামের ভাল এবং খারাপ — দুটো দিকই আছে, যা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত), তন্মধ্যে ফল শুভ ও পীড়া অশুভ; অতএব পীড়া পরিত্যাগ করিবে। ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষের অর্থ ও কামদ্বারা চিত্তবৈকল্য জন্মে, অর্থলোভীর ধর্ম্ম ও কামদ্বারা এবং কামাসক্তের অর্থ ও ধর্ম্মদ্বারা পীড়া জন্মে (অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের মধ্যে, যে একটির পেছনে ছোটে, বাকিদুটি না পাওয়ার জন্য সে দুঃখ পায়। সেই জন্য তুমি ধর্ম, অর্থ, কাম তিনটেকেই চাইবে যাতে তোমাকে কোনভাবেই সমস্যায় না পড়তে হয়)। ৬৯-৭০

নিরহঙ্কার, অভিনিবিষ্ট[২৩], বিশুদ্ধস্বভাব ও অসূয়াশূন্য হইয়া সান্ত্ববাদ প্রয়োগ ও সর্ব্ববিষয়ের অনুসন্ধানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের[‡] সহিত মন্ত্রণা করিবে। ৭১

যাহা করিলে আপনার দীনভাব মোচন হয়, মৃদুই হউক আর দারুণই হউক, তাহা অবশ্য করিবে (অর্থাৎ রাজা যদি কোন কারণে সঙ্কটে পড়ে, তখন কোমল বা ভয়ঙ্কর যেকোন কর্মের দ্বারা যেন নিজেকে সেই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করে); এবং সমর্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে (বিরুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে বেড়িয়ে এলে, তখন আবার ধর্মপথে চলবে)। ৭২

সংশয়ারূঢ় না হইলে শুভলাভের প্রত্যাশা নাই; সংশয়ারূঢ় হইয়া যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই শ্রেয়োলাভ হয় (সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে না গেলে মানুষ কখনো উন্নতি করে না। প্রাণসঙ্কটে পড়েও যদি কেউ বেঁচে ফেরে, সে নিজের ভালো দেখতে পায়)। ৭৩

শোক ও সন্তাপদ্বারা যাহার বুদ্ধিবৃত্তি কলুষিত হইবে, নল ও রামাদির উপাখ্যান কথনদ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা করিবে (যারা শোক ও দুঃখের মধ্যে পড়েছে তাদেরকে প্রাচীনকালের কাহিনী শুনিয়ে সান্ত্বনা দেবে); নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তিকে ভাবী মঙ্গলের প্রত্যাশা প্রদর্শন ও পন্ডিতকে ধন দানাদি দ্বারা সান্ত্বনা করিবে। ৭৪

যিনি শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপন পূর্বক কৃতকার্য্যের ন্যায় নিতান্ত নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তিনি বৃক্ষাগ্রে প্রসুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় পতিত ও প্রতিবুদ্ধ[২৪] হয়েন (শত্রুর সাথে সন্ধি করে যে নিশ্চিন্তে বসে থাকে, সে আসলে গাছের ডালে ঘুমিয়ে থাকা ব্যক্তির মত। তার ঘুম তখনই ভাঙে, যখন সে গাছ থেকে পড়ে যায়। অর্থাৎ শত্রু ধোঁকা দিলে তবে তার হুঁশ ফেরে)। ৭৫

অসূয়াপরবশ না হইয়া যত্নপূর্ব্বক নিজ মন্ত্রণা গোপন করিয়া রাখিবে এবং রোষাবেশ সংবরণ করিয়া (অন্যের চরের কাছে নিজের চিন্তাভাবনা যেন প্রকাশ না পায়) চরদ্বারা (নিজের চরদ্বারা) সর্ব্ববিষয় অবধারণ করিবে। ৭৬

পরধর্ম্ম-বিদারণ, দারুণ কর্ম্ম সম্পাদন ও শত শত শত্রু সংহার না করিয়া মনুষ্য কখনই মহতী শ্রীলাভ করিতে পারে না। [ঠিক যেমন একজন মৎস্যজীবি বা জেলে অজস্র মাছ ধরে তবেই ধনী হয়]। ৭৭

শত্রুসৈন্য কর্ষিত (দুর্ব্বল), ব্যাধিত (রোগাক্রান্ত), ক্লিন্ন, অন্নপানবিবর্জ্জিত, বিশ্বস্ত ও মন্দ হইলেও প্রহার করিবে। ৭৮

অর্থী[২৫] অর্থীর নিকটে উপস্থিত হয় না। যদিও তাহাদের অভিলাষ সফল হয়, তথাচ উভয়ের সখ্য সংস্থাপন হওয়া নিতান্ত সুকঠিন (অর্থাৎ যখন তোমার কাজ মিটে যাবে, তখন আর বন্ধুত্ব রক্ষা করার প্রয়োজন নেই)। [তখন অন্যের কাজ, যেখানে তোমার সাহায্য করার কথা ছিলো, সেটা অসম্পূর্ণ রেখে দেবে] (অর্থাৎ তার কাজ যেহেতু এখনো শেষ হয় নি, তাই সে তোমার কাছে আসা যাওয়া করতে থাকবে)। ৭৯

সহায়সংগ্রহ ও শত্রুর সহিত বিগ্রহ করিতে যত্ন করিবে। সম্পদ্ লাভের ইচ্ছা ও তদ্বিষয়ে প্রভূত উৎসাহ প্রদর্শন করা বিধেয় (অর্থাৎ সফলতা চাইলে, রাজাকে উৎসাহী হতে হবে, যুদ্ধের রসদ জোগাড় করার চেষ্টার ক্রুটি রাখলে হবে না এবং বিগ্রহ অর্থাৎ শত্রুর সঙ্গে শত্রুতা বা বিবাদ করতেও পিছুপা হলে হবে না)। ৮০

এইরূপ লোকের কার্য্য কি শত্রু, কি মিত্র, কেহই কিছুমাত্র অবধারণ করিতে পারে না, কেবল কার্য্যের উদ্যোগ ও পর্য্যবসানমাত্র প্রত্যক্ষ করে (অর্থাৎ রাজা কখন কি করবেন তা যেন শত্রু বা বন্ধু কেউই জানতে না পারে; যখন কাজ শুরু বা শেষ হয়ে গেছে, একমাত্র তখনই যেন তারা জানতে পারে)। ৮১

যদবধি ভয় উপস্থিত না হয়, তদবধি ভয়কে ভয় করিবে; কিন্তু ভয় আগত হইলে স্থিরচিত্তে প্রতীকার করিতে চেষ্টা করিবে। ৮২

দণ্ডায়ত্ত শত্রুকে (শত্রু যখন নিজের মুঠোর মধ্যে) যে রাজা ধনমানাদি প্রদানপূর্ব্বক অনুগ্রহ করেন, তিনি আপনার মৃত্যু সংগ্রহ করিয়া রাখেন। ৮৩

অনাগত কার্য্যকেও অচিরাগত বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহার অনুসরণ করিবে; কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ আপনার উদ্দেশ্য সাধনে কদাচ উপেক্ষা বা অনাদর প্রদর্শন করা বিধেয় নহে (অর্থাৎ ভবিষ্যতের কাজকে ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রাখবে না; মনে করবে যেন সেটা

বর্তমানেরই কাজ এবং কাজে লেগে পরবে; বুদ্ধির দোষে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়কে উপেক্ষা করবে না)। ৮৪

সম্পদ্ লাভার্থে যত্নপূর্ব্বক স্বীয় উৎসাহবর্দ্ধন করিবে ও দেশ, কাল বিভাগ করিয়া পারলৌকিক কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ[**] পর্য্যায়ক্রমে সেবা করিবে (কোন কাজ এমনভাবে করবে যা দেশ, কাল, ভাগ্য, ধর্ম, অর্থ, এবং কাম এই সবকিছুর উপযোগী); কারণ, দেশ কাল বিবেচনা না করিলে শ্রেয়োলাভ হওয়া দুষ্কর। ৮৫

শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অল্প হইলেও কদাচ উপেক্ষা করিবে না, কারণ, তাহারাই আবার কালক্রমে শত্রুভাব বদ্ধমূল করিতে পারে। যেমন বনমধ্যে বহ্নি নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অল্প হইলেও কালসহকারে তাহাদিগের দলপুষ্টি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ৮৬

যিনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় আপনাকে সন্ধুক্ষিত[২৬] ও উত্তেজিত করেন (অর্থাৎ আগুনের ছোট ফুলকি যেমন ধীরে ধীরে, বিভিন্ন জিনিষ পোড়াতে পোড়াতে, জ্বলতে জ্বলতে ক্রমশঃ বড় অগ্নিপিন্ডে পরিণত হয় ঠিক তেমন) তিনি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমূহ শত্রুকে এককালে বিনাশ করিতে পারেন। ৮৭

প্রথমতঃ অর্থীকে (শত্রুকে) বহু কালব্যাপিনী আশা প্রদান করিবে, কাল উপস্থিত হইলে বিঘ্নের কথা উত্থাপন করিবে; নিমিত্তদ্বারা বিঘ্ন ও হেতুদ্বারা নিমিত্ত প্রকাশ করিবে (অর্থাৎ শত্রুকে অনেক দিন ধরে আশা দিয়ে যাবে, কিন্তু সেই আশা পূরণ করবে না; আশাপূরণের সময় এলে, কোন না কোন একটা বিঘ্ন বা অজুহাত তৈরী করবে। সেই অজুহাতের কিছু কারণ দেখিয়ে দেবে এবং সেই কারণের পেছনে কিছু যুক্তি দেবে)। ৮৮

শত্রুসংহারকারী রন্ধ্রানুসারী অতি দারুণ সহায়-সংগ্রাহী ছদ্মবেশী রাজা ক্ষুরের ন্যায় শত্রুর প্রাণ সংহার করিয়া থাকেন (লোহার ক্ষুর যেমন শান দিয়ে ধারালো করে খাপের ভেতরে লুকিয়ে রাখা থাকে, কিন্তু সময় এলে সেটাই শরীরের সমস্ত চুল কামিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি রাজাকে উপযুক্ত সময় যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ নিজের মনোভাব গোপন করে, যা যা

সহায় প্রয়োজন তা সংগ্রহ করে যেতে হবে। কিন্তু যখন সময় আসবে, তখন ক্ষুর বা ছুরির মত নির্দয়ভাবে শত্রুপক্ষের সকলের প্রাণ নিতে হবে)। ৮৯

অতএব মহারাজ! পাণ্ডব বা অন্য যে কেহ হউক না কেন, তাঁহাদিগের সহিত ন্যায়ানুগত (নীতিশাস্ত্র অনুসারে) ব্যবহার করিলে আপনি কখনই বিপদে পড়িবেন না এবং নির্ব্বিবাদে আপনার কার্য্য সাধন করিতে পারিবেন। ৯০

বিশেষতঃ আপনি সর্ব্বকল্যাণসম্পন্ন ও কুলশীলবিশিষ্ট; অতএব পাণ্ডুনন্দন হইতে আপনাকে (নিজেকে) রক্ষা করুন। ৯১

[মহারাজ, পান্ডুপুত্রেরা অনেক বেশী বলবান।] এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য তাহা কহিলাম, আপনি পুত্র সমভিব্যাহারে[২৭] পরামর্শ করিয়া যাহা শ্রেয়ঃ কল্প হয়, করুন [যাতে আপনাকে ভবিষ্যতে পস্তাতে না হয়]। ৯২

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়া কণিক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রও তদবধি নিতান্ত শোকাকুল হইলেন। ৯৩

---

[*] কোষবল — কোষ মানে হচ্ছে রাজকোষ বা রাজার ধনভান্ডার এবং বল মানে সৈন্যবল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজকোষ এবং সৈন্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে —

"রাজ্যের সাতটি অঙ্গ রয়েছে। এগুলি হল রাজা, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোষ (রাজকোষ), বল (সৈন্যবল) ও মিত্র" (অর্থশাস্ত্র — ৬.১.১)।

"রাজকোষের সম্পদ রাজা এবং রাজার পূর্বপুরুষ দ্বারা ন্যায়ানুসারে অর্জিত হওয়া উচিত। এতে প্রচুর সোনা, রূপো, নানা রত্ন এবং নগদ টাকা থাকবে যাতে কোন দীর্ঘস্থায়ী বিপদে বা ভবিষ্যতে অর্থাগম না হলেও রাজকোষ যেন সেই চাপ সহ্য করতে পারে" (অর্থশাস্ত্র — ৬.১.১০)।

"পুরুষানুক্রমিক ভাবে যেন সেনাবাহিনীতে ভর্তি নেওয়া হয়, অর্থাৎ সেনার পরিবার থেকেই যেন ভবিষ্যতের সেনা আসে। এতে সেনা বশংবদ হবে এবং সেনাবাহিনীতে স্থিরতা থাকবে। সেনার পরিবারের অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রের রাজা যেন দেখভাল করেন। দূরে

অভিযানে গেলে পথের কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা সেনার মধ্যে যেন থাকে, আঘাতে যেন সহজে ভেঙে না পড়ে। সেনার যেন বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থাকে, বিভিন্ন প্রকার যুদ্ধ এবং অস্ত্র চালনায় যেন দক্ষ হয়, রাজার ভালো-খারাপ সব সময়েরই যেন সঙ্গী হয়, যেন দ্বিধাগ্রস্ত না হয়। সেনাতে যেন ক্ষত্রিয় জাতির লোকই বেশী থাকে” (অর্থশাস্ত্র — ৬.১.১১)।

† উপায়— উপায় সম্বন্ধে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে।

“উপায় চার প্রকার — সাম, দান, ভেদ ও দন্ড। এর মধ্যে সাম পাঁচ প্রকার — গুণসংকীর্ত্তন, সম্বন্ধোপাখ্যান, পরস্পরোপকারসন্দর্শন, আয়তিপ্রদর্শন এবং আত্মোপনিধান।

গুণসংকীর্তন মানে হচ্ছে শত্রু বা বিপক্ষের প্রশংসা করা এবং তার উদ্দেশ্য স্তুতিবাক্য ব্যবহার করা। শত্রুর বংশগৌরবের উল্লেখ করা, তার শারীরিক দক্ষতা বা অঙ্গ সৌষ্ঠবের প্রশংসা করা, তার কাজ, স্বভাব, শিক্ষা, ধনসম্পদের প্রশংসা করা।

সম্বন্ধোপাখ্যান মানে শত্রুর সঙ্গে রাজার যে কোন একটা সামাজিক সম্বন্ধ রয়েছে সেটা শত্রুকে মনে করিয়ে দেওয়া। যেমন যদি কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে বা বৈবাহিক সম্বন্ধ থাকে, বা হয়তো গুরুগৃহে পড়াশোনাকালীন চেনাজানা ছিলো, বা যাজক (যিনি যজ্ঞ করেন)-যজমান (যার হয়ে যজ্ঞ করছেন বা যিনি যজ্ঞ করাচ্ছেন) সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ ধার্মিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে কোনপ্রকার সম্বন্ধ আছে, বা তারা দুজনে হয়তো একই বংশের, বা যদি তাদের মধ্যে মানসিক মিল থাকে বা তাদের একই মিত্র আছে — এই জাতীয় সম্বন্ধ থাকলে তার উল্লেখ করা।

পরস্পরোপকারসন্দর্শন এর অর্থ হল রাজা সেই শত্রুর জন্য যদি আগে কোন উপকার করে থাকেন বা সেই শত্রুও যদি রাজার কোন উপকার আগে করে থাকেন সেগুলি স্মরণ করা ও উল্লেখ করা।

আয়তিপ্রদর্শন এর মানে হল যদি আমরা দুজনেই এইভাবে চলি তাহলে ভবিষ্যতে দুজনেই লাভবান হব — এই জাতীয় আশা ব্যক্ত করা।

আত্মোপনিধান মানে শত্রুকে এইরকম বলা যে আপনি আমি সব একই, যা আমার তাই আপনার। আমার যা ধনসম্পদ তা তো আপনারই জন্য।

দান হল অর্থের দ্বারা অপরপক্ষকে সহায়তা করা।

ভেদ হল দুপ্রকার। শত্রুর মনে দ্বিধা তৈরী করা এবং শত্রুকে ধমক দেওয়া যে তোমার ক্ষতি করে দেব।

দন্ড হল সৈন্যবল ব্যবহার করা। তিনপ্রকারের দন্ড রয়েছে – শত্রুর আর্থিক ক্ষতি করা, শত্রুকে উৎপীড়ন করা এবং শত্রুকে হত্যা করা।"

– অর্থশাস্ত্র ২.১০.৪৭-৫৬

সূতরাং আমরা দেখছি যে সাম-দান-ভেদ-দন্ড হল বিভিন্ন উপায় যার দ্বারা শত্রুর মোকাবিলা করা যায়। প্রথমে সামপ্রয়োগ করতে হয় যেখানে ভালো কথায় শত্রুকে বোঝানো হয়। কথায় কাজ হলে ভালো, নইলে টাকা পয়সা দিয়ে মুখবন্ধ করতে হয়। তাতেও যদি কাজ না হয় সেক্ষেত্রে শত্রু শিবিরে বিভেদ বা দ্বন্দ্ব তৈরী করতে হয় এবং হুমকি দিতে হয়। তাতেও যদি কাজ না হয়, শেষ উপায় বলপ্রয়োগ। যুদ্ধ অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ বিষয়, ধনহানি, প্রানহানি। তাই প্রথমে যাতে যুদ্ধ না করে সমাধান হয় তার চেষ্টা করা হয়। যদি শত্রু তাতে না শোধরায়, তাহলে সে যে ভাষা বোঝে, তাকে সেই ভাষাতেই বোঝানো হয়।

††রাজ্যাঙ্গ – "রাজ্যের সাতটি অঙ্গ রয়েছে। এগুলি হল রাজা, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোষ (রাজকোষ), বল (সৈন্যবল) ও মিত্র" (অর্থশাস্ত্র – ৬.১.১)।

‡ পলায়ন– রাজাকে পালানোর উপদেশ দেওয়া হচ্ছে শুনে অবাক হতে পারেন। কিন্তু পালানোও একটি যুদ্ধের কৌশল। মনে রাখতে হবে যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য বীরের মত মৃত্যুবরণ করা নয়। যুদ্ধের উদ্দেশ্য জয়লাভ করা, যে কোন মূল্যে। যখন শক্তি কম, তাখন যুদ্ধের মুখোমুখি হওয়া মানে পরাজয় এবং মৃত্যু নিশ্চিত। পালিয়ে গেলে, পরে শক্তি সংগ্রহ করে উপযুক্ত সময়ে শত্রুকে হারানো সম্ভব।

মহাভারতেই আমরা দেখতে পাই যে কৃষ্ণ কংসকে হত্যা করেছেন। কংস ছিলেন জরাসন্ধের জামাই। তাই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জরাসন্ধ তখন রাগে ফুঁসছেন। জরাসন্ধ সে সময় প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা। কৃষ্ণ দেখলেন জরাসন্ধকে পরাস্ত করার ক্ষমতা সেইসময় যাদবদের নেই। তাই তিনি পালালেন। জরাসন্ধ পূর্বভারতে। কৃষ্ণ গিয়ে পালালেন একেবার ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে; গুজরাতের উপকূলে। পরে সুযোগবুঝে জরাসন্ধকে কৃষ্ণ হত্যা করিয়েছেন। কৃষ্ণের মত রাজনীতি তৎকালীন ভারতে আর কেউ বুঝতো না। সেজন্য কথাই ছিল – যেদিকে কৃষ্ণ, সেদিকে জয়।

ভারতের ইতিহাসে দেখবেন রাজপুত যোদ্ধারা বীর ছিলেন কিন্তু কূটকৌশল খুব একটা ব্যবহার করতেন না। ফল বিষময় হয়েছিল; বিদেশী শক্তিকে প্রতিহত করতে শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অন্যদিকে শিবাজীকে দেখুন, বীরত্বের পাশাপাশি কৌশল ব্যবহার করে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ছয় ধরণের কৌশলের কথা বলা হয়েছেঃ সন্ধি, বিগ্রহ, আসন, যান, সংশ্রয়, দ্বৈধীভাব। (অর্থশাস্ত্র — ৭.১.১-২)

"সন্ধি হচ্ছে যখন বিপক্ষের সঙ্গে ভূমি বা অর্থের বিনিময়ে পণবন্ধন, অর্থাৎ শান্তিচুক্তি। বিপক্ষের সঙ্গে যখন বিবাদ, কলহ বা শত্রুতা করা হয় তাকে বলা হয় বিগ্রহ। সন্ধি বা বিগ্রহ কোনটাই না করে শত্রু শত্রুর মত রয়েছে, রাজা নিজের রাজ্যে নিজের মত রয়েছেন — এটি হল আসন। শত্রুর বিরুদ্ধে রাজা যখন যুদ্ধে যাচ্ছেন সেটি হল যান। বলবান মিত্র রাজার কাছে, নিজের স্ত্রী পুত্র পরিবার ও ধন সম্পদ নিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করার নাম সংশ্রয়। এটি বস্তুতঃ পলায়ন। দ্বৈধীভাব হচ্ছে যখন শান্তিচুক্তি করে একই সঙ্গে শত্রুতা শুরু করছেন" (অর্থশাস্ত্র — ৭.১.৬-১২)।

"বিপক্ষের সঙ্গে নিজের বলাবল তুলনা করে রাজার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ। রাজা যখন বিপক্ষের তুলনায় দুর্বল হয়ে পড়ছেন, তখন রাজার সন্ধি করা উচিত। যখন তিনি শক্তিশালী হয়ে উঠছেন, তখন বিগ্রহ করা উচিত। যখন রাজা বুঝছেন যে পরিস্থিতি এমন যে আমিও শত্রুকে আঘাত করতে পারব না, আর শত্রুও আমাকে আঘাত করতে পারবে না, সেক্ষেত্রে আসন গ্রহণ করা উচিত। রাজা যখন শত্রুর তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী এবং সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছেন তখন যুদ্ধযাত্রা করা উচিত। কিন্তু যখন রাজা দুর্বল, তখন আশ্রয় নেওয়া উচিত। যখন রাজার কোন কাজের জন্য সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন আছে, তখন দ্বৈধীভাব অবলম্বন করা উচিত" (অর্থশাস্ত্র — ৭.১.১৩-১৮)।

‡ ব্রাহ্মণ — ব্রাহ্মণ বলতে এখানে নীতিশাস্ত্রজ্ঞ বোঝাই যুক্তিসঙ্গত হবে। এখানে রাজাকে পুরোহিতমশাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করার কথা বলা হচ্ছে না। রাজা শস্ত্রে পারদর্শী। মন্ত্রীপদ, যা সাধারণত ব্রাহ্মণরাই অলংকৃত করতেন, তারা শাস্ত্রে পারদর্শী। ক্ষমতা এবং কৌশল যখন একত্রিত হবে তখন তা অপ্রতিরোধ্য। সেইজন্য ব্রাহ্মণদের সাথে আলোচনার কথা বলা হয়েছে। আরেকটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতে কিন্তু বর্ণবিভাগ গুণ ও কর্ম অনুসারে ছিল। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলছেন — "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং

গুণকর্ম্মবিভাগশঃ” (গীতা — ৪.১৩)। অর্থাৎ “গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে বর্ণচতুষ্টয় (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) আমিই সৃজন করেছি।” তাই গুণ ও কর্ম অনুসারে বর্ণবিভাগ হয়েছে জন্ম অনুসারে নয়। তাই একবর্ণ থেকে আরেক বর্ণে যাতায়াত এবং ভিন্ন বর্ণের মধ্য বিয়ে চলত। প্রাচীন ভারতে এর বহু উদাহরণ রয়েছে। বিশদে বলার জায়গা এটা নয়। দুএকটা উল্লেখ করছি। ধৃতরাষ্ট্রের পিতামহ অর্থাৎ ভীষ্মের পিতা ছিলেন শান্তনু। তার দাদা দেবাপি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ হয়ে গিয়েছিলেন। মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসদেবের বাবা ব্রাহ্মণ, কিন্তু মা ব্রাহ্মণ নন।

** ত্রিবর্গ— হিন্দু জীবনচর্যায় জীবনের চারটি লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে; এদের একত্রে বলা হয় চতুর্বর্গ। এগুলি হল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। জীবনে যা কিছু আমরা চাই, বা যা কিছু আমাদের প্রয়োজন তা সবই এই চারটি ভাগের অন্তর্গত। এর মধ্যে মোক্ষ ইহজীবনের বিষয় নয়। মোক্ষ হল সংসারে বারবার আসা যাওয়া থেকে মুক্তি। অর্থাৎ, মৃত্যুর পরে আর যেন জন্ম না হয়। পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি। এই চাহিদাটা বাদ দিয়ে যে বাকি তিনটি, অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম তা ইহজগতের চাওয়া পাওয়া নিয়ে। ধর্ম মানে এখানে ‘রিলিজিওন’ নয়; ধর্ম মানে হচ্ছে কর্তব্য, চারিত্রিক উৎকর্ষতা। অর্থ মানে সম্পদ, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য, ক্ষমতা। কাম হল ভোগ, বাসনা, চাহিদা, আসক্তি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, সুখ। এই তিনটিকে একত্রে বলা হচ্ছে ত্রিবর্গ। যেহেতু নীতিশাস্ত্র বাস্তব জগতের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায়, এই জীবনে কি করে সুষ্ঠভাবে, বিপদ-আপদ এড়িয়ে বাঁচা যায় তাই নিয়ে মাথা ঘামায়, তাই ত্রিবর্গের কথা বলা হয়েছে। মোক্ষের জন্য রয়েছে মোক্ষশাস্ত্র, তার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

কৌটিল্য বলছেন —

“রাজার উচিত ধর্ম বা অর্থের সঙ্গে বিরোধ না ঘটিয়ে ভোগবাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টা করা। ভোগবাসনা বা সুখ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করার প্রয়োজন নেই। অথবা, তিনি এই ত্রিবর্গের অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটির পেছনেই সমান ভাবে ধাবিত হবেন। কারণ ধর্ম, অর্থ কামের মধ্যে যদি কোন একটির দিকে রাজা বেশী মনোযোগ দিয়ে ফেলেন তাহলে সেটি তো নষ্ট হয়ই, তার সাথে বাকি দুটোও নষ্ট হয়। এই ত্রিবর্গের মধ্যে অর্থই প্রধান, কারণ ধর্ম আর কাম অর্থের উপরেই নির্ভর করে।” (অর্থশাস্ত্র — ১.৭.৩-৭)

অর্থাৎ কৌটিল্য জীবনে একটা ভারসাম্য রাখার কথা বলছেন। রাজা যদি শুধু ইন্দ্রিয়তৃপ্তির দিকে ছুটতে থাকেন তাহলে রাজকোষ ফাঁকা হয়ে যাবে এবং রাজা তার ধর্ম থেকেও বিচ্যুত হবেন, তিনি রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে উঠবেন এবং প্রজাদের দেখভালে অমনোযোগী হয়ে উঠবেন। আবার শুধু যদি ধর্মপরায়ণ হন, প্রজাহিতে মুক্তকচ্ছ হয়ে দান করতে শুরু করেন কোষাগারে চাপ পড়বে, রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়বে। শত্রুর আক্রমণ হলে ঠেকাতে পারবেন না। আবার রাজা যদি শুধুই কোষাগার আর ক্ষমতার কথা ভাবতে থাকেন তাহলে শেষপর্যন্ত তিনি প্রজাদের নিপীড়ন করবেন। এটা অবশ্যম্ভাবী। সেক্ষেত্রেও তিনি ধর্ম থেকে চ্যুত হবেন।

~

অভিধান

১. উৎসিক্ত — বর্দ্ধনশীল।

২. অসূয়া — ঈর্ষা।

৩. বিগ্রহ — কলহ, বিবাদ, দ্বন্দ্ব।

৪. শরাসন — ধনুক।

৫. অগ্ন্যাধান — অগ্নিহোত্র রক্ষা।

৬. কাষায়বস্ত্র — গৈরিকবস্ত্র।

৭. জটাজিন — জটা, মৃগ বা ব্যাঘ্র-চর্ম্মাদি দ্বারা কৃত্রিম সাধুবেশ।

৮. বৃক — নেকড়ে বাঘ।

৯. অঙ্কুশ — আঁকশি।

১০. বহুভাষী — কথায় ভুলাইতে পারে এইরূপ।

১১. কৃপণ — দীন।

১২. জম্বুক — শৃগাল বা শেয়াল।

১৩. বিচেষ্টমান — নিস্পন্দ, নড়াচড়া রহিত।

১৪. অহংকার-পরতন্ত্র — অহংকারের বশীভূত হয়ে।

১৫. কলত্র — পত্নী।

১৬. পিশিতাশন — মাংসাশী [পিশিত (মাংস) + অশন (ভোজ্য)]।

১৭. কৃতস্নান — স্নাত, যিনি চান করেছেন।

১৮. জিগীষা — জয়ের ইচ্ছা।

১৯. অবলিপ্ত — গর্ব্বিত, অহংকারে অপরের পরামর্শে পরাঙ্মুখ।

২০. মহীধর — পর্বত।

২১. সর্ব্বসমবায় — সেই সমস্ত জায়গা যেখানে বহু লোকজন সমবেত হয়।

২২. সান্ত্ববাদ — আশ্বাস, প্রবোধ, অভয়, সান্ত্বনা, ভরসা।

২৩. অভিনিবিষ্ট — অতিশয় যত্নশীল, গাঢ়মনোনিবেশকারী।

২৪. প্রতিবুদ্ধ — জেগে ওঠা।

২৫. অর্থী — অভিলাষী, প্রার্থনাকারী।

২৬. সন্ধুক্ষিত — প্রজ্বলিত, উত্তেজিত।

২৭. সমভিব্যাহারে — সঙ্গে, সাথে।

~

Table of Contents